LEARN GEETA
तस्मात् योगी भवार्जुन

॥ श्रीहरि ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

|| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ||

অধ্যায় 9: রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

2/3 (শ্লোক 10-19), রবিবার, 26 মে 2024

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিদুষী মাননীয়া বন্দনা বর্ণেকর মহাশয়া

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/bJQeGRdB0ds

পরমাত্মাই অনন্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা

হরিনাম সংকীর্তন, হনুমান চালিশা পাঠ, দীপ প্রজ্জ্বলন এবং গুরুবন্দনার পর নবম অধ্যায়ের মধ্যাংশের বিবেচন সত্রের শুভারম্ভ হয়। নবম অধ্যায় ভগবদ্গীতার এক অতি সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেথায় ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান এবং গুহ্যতম রহস্য তাঁর প্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জুনকে রণাঙ্গণে জানিয়েছেন। এই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগের ত্রিবেণী সঙ্গম পরিলক্ষিত হয়।

মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ গীতা-ভাষ্যকার পরম পূজ্য শ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন যে গীতার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে নবম অধ্যায়ের বিষয়ে জানা আবশ্যক। যুদ্ধভুমিতে ভগবান অর্জুনকে বিজ্ঞানসহ জ্ঞান প্রদান করেছেন। ভগবদ্গীতার রহস্য জানলে মায়াময় এই সংসার থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। যদি পরমাত্মার সাথে একাত্মা হওয়াই জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহলে এই অধ্যায়ই সঠিক পথ দেখায়। এই অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে প্রকৃতি ও পরমাত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধের গুহ্যতম রহস্য জানিয়েছেন কারণ ভগবান জানতেন যে এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা অর্জুনের আছে। তাই এই রহস্যকে জানতে হলে অর্জুনের গুণসমূহ আমাদের মধ্যেও জাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে একই পংক্তিতে উপবেশন করা নিমন্ত্রিত সমস্ত অতিথিগণকে যেমন একই খাবার পরিবেশন করা হয়, ঠিক তেমনই অর্জুনের গুণসমূহ ধারণকারী ব্যক্তিও অর্জুনের ন্যায় এই দূর্লভ জ্ঞান লাভ করার অধিকারী হন।

এই অধ্যায়ের প্রথমার্ধের বিবেচন সত্রে আমরা দেখেছি যে ভগবান কীভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে বলা আরম্ভ করেছেন এবং এই সৃষ্টিতে পরমাত্মা কিভাবে অধিষ্ঠান করছেন সেই বিষয়েও বলেছেন। ভগবান তিনটি কথা বলেছেন — প্রথমে বলেছেন জ্ঞান ও বিজ্ঞান কী ? তারপর বলেছেন যে এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান অতি পবিত্র এবং শেষে বলেছেন যে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অতি সহজ। এই জ্ঞানের মহিমা ব্যক্ত করার পর এই সৃষ্টিতে অবিনশ্বররূপে পরমাত্মার অধিষ্ঠান সম্পর্কে ভগবান ধীরে ধীরে আলোচনা শুরু করেছেন।

পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহে ভগবান বলেছেন যে কল্পারম্ভে ভগবান সমস্ত প্রাণীগণকে বারংবার সৃষ্টি করেন কিন্তু এই সৃষ্টি রচনাদি কর্মে তিনি অনাসক্ত এবং উদাসীনের মতো থাকায় এই কর্মসমূহ তাঁকে আবদ্ধ করে না।

যেমনভাবে সিনেমার পর্দায় যখন একটি দৃশ্য ফুটে ওঠে, তখন সেই দৃশ্যটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পর্দা হল একটি মাধ্যম, বাস্তবে সেই দৃশ্যটি পর্দায় অভিনীত হচ্ছে না। সেই পর্দায় শুধুমাত্র দৃশ্য অঙ্কিত হচ্ছে, ছবির মাধ্যমে দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে, কিন্তু পর্দাটি অপরিবর্তিতই রয়েছে। একইভাবে অপরিবর্তনীয় পরমাত্মার অধ্যক্ষতায় এই পরিবর্তনশীল

জগতের সকল কর্মকাণ্ড চলছে । পর্দায় দৃশ্য আছে, কিন্তু দৃশ্যতে পর্দা নেই। সিনেমা দেখার সময় আমরা দৃশ্যপটে এতটাই মগ্ন হয়ে যাই যে পর্দার কথা আমাদের মনেই আসে না। ঠিক তেমনই পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্ট এই সৃষ্টিতে আমরা ডুবে যাই, স্রষ্টাকে জানার ব্যাকুলতা আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। পরমাত্মাকে জানার পথ ভগবদ্গীতা সুগম করে।

নবম শ্লোকে ভগবান কর্মে আসক্তি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান কর্তৃত্বাভিমানের বিষয়ে বলেছেন।

9.10

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ(স্), সূয়তে সচরাচরম্
হেতুনানেন কৌন্তেয়, জগদ্বিপরিবর্ততে।।10।।

প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। হে কৌন্তেয় ! সেইজন্যই জগৎ বিবিধ প্রকারে পরিবর্তিত হয়।

ভগবানের অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ পরমাত্মার থেকে শক্তি লাভ করে প্রকৃতি এই চর-অচর, জড়-চেতন আদি সমস্ত জীব জগৎ সৃষ্টি করে। পরমাত্মা থেকে শক্তি লাভ করে প্রকৃতি এই সৃষ্টি রচনা করলেও পরমাত্মার মধ্যে কোন কর্তৃত্ববোধ আসে না। যেমন লাইট, পাখা, লিফট, কম্পিউটার ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ-এর সংযোগে কার্যকরী হয়ে উঠে; বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যতীত এইসব যন্ত্রপাতির নিজস্ব কোন শক্তি নেই, বিদ্যুতের শক্তিতেই এসব শক্তিশালী হয়ে উঠে। ঠিক তেমনই জগতে যা কিছু পরিবর্তন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার ইত্যাদি যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে, তা সবই প্রকৃতির দ্বারাই হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সবই ভগবানের অধ্যক্ষতার অধিষ্ঠানবশতই হচ্ছে অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তি দ্বারা শক্তিশালী হয়ে প্রকৃতিই সমস্ত করে। তাৎপর্য হল বিদ্যুৎ-এ বিভিন্ন প্রকার শক্তি অন্তর্হিত থাকলেও সেটি যেমন মেশিনের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়, ঠিক তেমনই পরমাত্মার অনন্ত শক্তি প্রকৃতির সাহায্যে প্রকটিত হয়।

ভগবান বলেছেন **'হেতুনানেন জগদ্বিপরিবর্ততে'** — অর্থাৎ পরমাত্মার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি করে এবং সেইজন্য জগতে নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়। এখানে ভগবান কী পরিবর্তনের কথা বলেছেন?

যতক্ষণ প্রাণীদের প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য শরীরের সাথে 'আমি' এবং 'আমার' সম্পর্ক বজায় থাকে ততক্ষণ তাদের নানাপ্রকার পরিবর্তন হয় অর্থাৎ কখনো ইহলোকে কখনো পরলোকে, কখনো এই দেহে আবার কখনো অন্য দেহে ইত্যাদি। তাৎপর্য হল ভগবদপ্রাপ্তি না হওয়া অবধি এই সব প্রাণীদের স্থায়ী স্থিতি হয় না অর্থাৎ তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

সূর্যের প্রকাশে সকল প্রাণী কাজ-কর্ম করে এবং সেইসব কর্ম বৈধ এবং অবৈধ— দুই প্রকারেরই হয়। এই কর্ম অনুসারে প্রাণী অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি লাভ করে অর্থাৎ কেউ সুখী হয় বা কেউ দুঃখী, কেউ ঊর্ধ্বগামী বা কেউ অধোগামী ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু সূর্য এবং তার প্রকাশ একই থাকে। ঠিক তেমনই জগতে যদিও নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু পরমাত্মা ও তাঁর অংশ জীবাত্মা একইভাবে বিরাজ করেন । প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না।

যিনি নিত্য-নিরন্তর নিজের মধ্যে নিজে অবস্থান করেন, যাঁর আশ্রয়ে প্রকৃতি গতিশীল এবং জগৎ পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই পরমাত্মাকে উপেক্ষা করে যারা বিপরীতমুখী হয়, তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করা হয়েছে।

9.11

অবজানন্তি মাং(ম্) মূঢা, মানুষীং(ন্) তনুমাশ্রিতম্

পরং(ম্) ভাবমজানন্তো, মম ভূতমহেশ্বরম্।।11।।

অবিবেকী (মূর্খ) ব্যক্তিগণ সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর-স্বরূপ আমার পরমভাব না জেনে আমাকে মনুষ্যদেহধারী (সাধারণ মানুষ) মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে।

যিনি অব্যক্ত, নিরাকার, নির্বিকার, সেই পরমাত্মাই লীলাবশে মনুষ্যদেহ ধারণ করে অবতাররূপে এই জগতে আবির্ভাব হন। কিন্তু অবিবেকী মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁর অবতারতত্ত্ব না জেনে তাঁকে সাধারণ মানুষ হিসেবে অবজ্ঞা করে।

ভগবান দেহাশ্রিত নন। তারাই দেহাশ্রিত হয়, যাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগের জন্য দেহধারণ করতে হয়। কিন্তু ভগবানের মানবদেহ ধারণ কর্মজনিত নয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় প্রকটিত হন। তাই তাঁর কর্মবন্ধন হয় না এবং তিনি দেহাশ্রিত হন না।দেহ-ই তাঁকে আশ্রয় করে অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিকে অধিকৃত করে প্রকটিত হন। তাৎপর্য হল এই যে সাধারণ প্রাণী প্রকৃতির পরবশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই কর্ম করে, কিন্তু ভগবান স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে আবির্ভাব হন এবং প্রকৃতি তাঁর নির্দেশানুযায়ী কর্ম করে।

যখন কোন অবতারের আবির্ভাব হয়, তখন অনেকেই তাঁকে চিনতে বা জানতে পারে না এবং ঈশ্বর বলে গ্রহণ করে না। ভক্ত, অভক্ত সকল যুগেই আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালেও ছিল। সেকালের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। পক্ষান্তরে শিশুপালাদি তাঁকে সাধারণ মানুষ বলেই জানতেন। রাজসূয়-যজ্ঞ উপলক্ষে ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের প্রস্তাব দিলে শিশুপাল তার তীব্র বিরোধিতা করে পান্ডব, ভীষ্মদেব এমনকী পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকেও যথেষ্ট গালাগালি দিয়েছিলেন।

তাঁকে অবজ্ঞা করার ফল ভগবান পরবর্তী শ্লোকে জানিয়েছেন।

9.12

মোঘাশা মোঘকর্মাণো, মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ
রাক্ষসীমাসুরীং(ঞ) চৈব, প্রকৃতিং(ম্) মোহিনীং(ম্) শ্রিতাঃ।।12।।

যে সকল বিবেকহীন ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী (হিংসা) এবং মোহিনী (বুদ্ধিভ্রংশকারী) প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের সব আশা ব্যর্থ, সমস্ত শুভকর্ম এবং সমস্ত জ্ঞান ব্যর্থ অর্থাৎ তাদের আশা, কর্ম এবং জ্ঞান শুভ-ফল প্রদান করে না।

‘মোঘাশা’ — অর্থাৎ নিষ্ফলকাম। ভগবানে বিমুখ হয়ে হিংসাপ্রবল, কামদর্পাদিপ্রবল এবং বুদ্ধিভ্রংশকারী ব্যক্তিগণ যে জাগতিক সুখের কামনা করে, তাদের সেই কামনা ব্যর্থ হয়। কারণ বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল বস্তুর কামনা যে পূর্ণ হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি কখনো পূর্ণ হয়ও, তথাপি তা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ সেই ফল নষ্ট হয়ে যায়। তাৎপর্য এই যে যতক্ষণ পরমাত্মা লাভ না হয়, ততক্ষণ যত জাগতিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা অথবা তার প্রাপ্তি ঘটুক না কেন, তা সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।

‘মোঘকর্মাণঃ’ — অর্থাৎ বিফলকর্মা। ঈশ্বর-বিমুখ হয়ে মানুষ শাস্ত্রবিহিত যতই শুভকর্ম করুক না কেন, পরিণামে তা সবই বিফল হয়। কারণ মানুষ কামনা নিয়ে শাস্ত্রবিহিত যে সব কর্ম করে, সেই কর্মের এবং কর্মফলের আদি-অন্ত থাকে। সেই কর্মের ফলস্বরূপ মানুষ ঊর্ধ্বলোক প্রাপ্ত হলেও তাকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আস্তে হয়। অর্থাৎ পরিণামে তার সকল কর্ম বিফল হয়। তাৎপর্য হল এই যে মানুষ স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ যা চিরস্থায়ী। কিন্তু কর্ম এবং কর্মফল চিরস্থায়ী নয়, এসব আদি-অন্ত বিশিষ্ট। সুতরাং যতক্ষণ পরমাত্মা প্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ সকামভাবে যে কাজই করুক এবং সেই কর্মের ফল ভোগ করুক না কেন, তা চিরস্থায়ী হয় না।

‘মোহজ্ঞানাঃ’ — অর্থাৎ বৃথাজ্ঞানী। ভগবদ্ভক্তিহীন পন্ডিতদের শাস্ত্রপান্ডিত্যাদি সব নিষ্ফল। যে ব্যক্তি ভগবানে বিমুখ হয়, সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করে তা নিষ্ফল হয় এবং তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

‘রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ’ — অর্থাৎ এই সকল বিবেকহীন ভগবদ্বিমুখ মানুষ তামসী, রাজসী ও বুদ্ধিভ্রংশকারী প্রকৃতির হয়। ভগবদ্বিমুখী তামসী, রাজসী এবং মোহিনী প্রকৃতিকে গীতায় আসুরী সম্পদ বলা হয়েছে। আসুরী সম্পদের অধিকারী হলে উপরিউক্ত তিনপ্রকার প্রকৃতি স্বতঃই প্রকাশ পায় । শ্রীকৃষ্ণ -অবতারে দেখা যায় যে কংস, শিশুপাল আদি ব্যক্তিগণ আসুরী সম্প্রদায়ের ছিল।

আসুরী সম্প্রদায়ভুক্ত ভগবদ্বিমুখী মানুষের কথা বলার পর ভগবান সাত্ত্বিক-প্রকৃতির মহাত্মাগণের কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

9.13

মহাত্মানস্তু মাং(ম্) পার্থ, দৈবীং(ম্) প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ
ভজন্ত্যনন্যমনসো, জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।13।।

কিন্তু হে পার্থ ! দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত অনন্যচিত্ত মহাত্মাগণ আমাকে সর্বভূতের আদি ও অবিনাশী জেনে আমার ভজনা করে থাকেন।

আগের শ্লোকে ভগবান আসুরীস্বভাব প্রাপ্ত মূঢ় ব্যক্তিদের কথা বলেছেন। এখানে ভগবান দৈবীসম্পদবিশিষ্ট মহাত্মাদের বিশেষত্ব অর্জুনকে জানিয়েছেন।

‘দৈবীং প্রকৃতিম্’ — এখানে পরমাত্মাকে **‘দেব’** বলা হয়েছে এবং পরমাত্মার সম্পদকে দৈবীসম্পদ বলা হয়েছে। দৈবীসম্পদের যত গুণ , তা সবই স্বাভাবিক গুণ এবং স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ সকল মানুষেরই এর উপর পূর্ণ অধিকার আছে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ এইসবের আশ্রয় নিয়ে ভগবদমুখী হন এবং নিজেদের কল্যাণ সাধন করেন।

মানুষের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতি তখনই প্রকটিত হয় যখন ভগবদ্প্রাপ্তিই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য দৈবীগুণের আশ্রয়েই মানুষ ভগবদ্মুখী হয়। দৈবীগুণের আশ্রয় নিলে তাঁর মধ্যে অভিমান (অহং কর্তৃত্ববোধ) আসে না।

যেসকল মানুষ ভগবানে বিমুখ হয়ে উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের ভোগ ও সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তারা **‘অল্পাত্মা’** অর্থাৎ মূঢ়। যাঁরা ভগবদ্ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, যাঁদের মোহ দূর হয়েছে, সত্য-তত্ত্বের দিকে যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের বলা হয় **‘মহাত্মা’।**

‘ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্’ — পরমাত্মা সকল প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী। তাৎপর্য হল এই যে, যখন জগৎ সৃষ্টি হয় নি তখনও পরমাত্মা ছিলেন এবং সমস্ত জগৎ যখন লীন হয়ে যাবে, তখনও তিনি থাকবেন — অর্থাৎ তিনি অনাদি-অনন্ত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী পরমাত্মা হতেই উৎপন্ন হয়, পরমাত্মাতেই অবস্থান করে আবার পরমাত্মাতেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু পরমাত্মা একইভাবে অবস্থান করেন। পরমাত্মার এই অনাদি, অব্যয়রূপ যাঁরা জেনেছেন, সেই মহাত্মাগণ অনন্যচিত্তে তাঁর ভজনা করেন। ভগবানই হলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশী বীজ— এইভাবে দৃঢ়তা সহকারে মানায় হল ভগবানকে আদি ও অবিনাশী রূপে জানা।

দৈবীগুণসম্পন্ন মহাত্মাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট এলেও জাগতিক বিনাশশীল বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ পিতৃবিয়োগের পর খুব আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বাড়ীতে মা-ভাইদের দুবেলা খাবার জোগাড় করাই তাঁর পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে ঠাকুরের কাছে এই কষ্টের কথা জানাতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যকে মা ভবতারিণীর কাছে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ চাইতে বললেন। গুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী স্বামীজী তিন-তিনবার মায়ের মন্দিরে গিয়েও এইসব কিছুই চাইতে পারলেন না। মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিবার **ভক্তি,জ্ঞান ও বৈরাগ্য** চাইলেন কারণ দৈবীগুণের অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল ঈশ্বর দর্শন, জাগতিক সুখ বা বিনাশশীল বস্তু নয়। অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে অবশ্য স্বামীজীর পরিবারের সদস্যদের ভাত-কাপড়ের কষ্ট লাঘব হয়েছিল।

9.14

সততং(ঙ্) কীর্তয়ন্তো মাং(য়ঁ), য়তন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং(ম্) ভক্ত্যা, নিত্যয়ুক্তা উপাসতে॥9.14॥

নিত্য-(আমাতে) যুক্ত ব্যক্তি দৃঢ়চিত্ত হয়ে যত্নপূর্বক সাধন-ভজন এবং ভক্তিপূর্বক কীর্তন করেন এবং আমাকে নমস্কার করে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন ।

'দৃঢ়ব্রতাঃ' — গীতায় পরমাত্মপ্রাপ্তির বিষয়ে তিন প্রকার যোগের উল্লেখ আছে— জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই শ্লোকে ভগবান ভক্তিযোগের প্রাধান্য দিয়েছেন। যারা জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহাদিতে ব্যাপৃত থাকে, তারা পারমার্থিক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হতে পারে না। কিন্তু সাত্ত্বিকী-প্রকৃতি-প্রাপ্ত মহাত্মাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল পরমাত্মা-প্রাপ্তি। ভক্তের মনের ভাব হল— ' হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস; তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ।' তাঁদের লক্ষ্য খুব দৃঢ় থাকে এবং তাঁরা নিজ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন না।

'নিত্যযুক্তাঃ' — ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবের সাথে ভগবানের অখণ্ড সম্বন্ধ থাকে। মানুষ যতক্ষণ এই সম্বন্ধটিকে চিনতে পারে না, ততক্ষণ সে ভগবদ্বিমুখ হয়ে থাকে, নিজেকে তাঁর থেকে পৃথক বলে মনে করে। কিন্তু যখনই সে ভগবানের সাথে নিজের নিত্য-সম্বন্ধের কথা জানতে পারে, তখনই সে ভগবানের আশ্রিত হয়। ভক্ত ও ভগবানের এই সম্বন্ধ কখনও বিস্মৃত হয় না। এই অটুট বন্ধনকেই 'নিত্যযুক্ত' বলা হয়েছে।

'যতন্তশ্চ' — সাংসারিক মানুষ যেমন মমত্ব সহকারে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের লালন-পালন করে, তেমনই ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য ভক্ত ঐকান্তিক ভাবে সাধনা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সাংসারিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সাংসারিক নয়। কারণ ভগবানই হলেন তাঁর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

'ভক্ত্যা কীর্তয়ন্তো মাম্' — ভক্তেরা কখনও প্রেমসহ ভগবদ্ নামকীর্তন করেন, কখনও নাম-জপ করেন, শাস্ত্র পাঠ করেন আবার কখনো ভগবদ্ সম্বন্ধীয় আলোচনা করেন অর্থাৎ যা কিছু করেন, সবই ভগবানের উদ্দেশ্যে করেন।

'সততং মাং উপাসতে' – ভগবান বলেছেন যে তাঁর অনন্য ভক্ত নিরন্তর তাঁর উপাসনা করেন। অর্থাৎ কীর্তন, প্রণিপাত ইত্যাদি ব্যতিরেকেও যে খাওয়া-দাওয়া,শয়ন-জাগরণ, ব্যবসা, চাষবাস ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে করে থাকেন।

ভক্ত যা কিছু বলেন, তা সবই ভগবানের গুণকীর্তন, তিনি যে সব ক্রিয়া-কর্ম করেন, তা সবই ভগবানের সেবা ভাব নিয়ে করেন। ভক্তেরা বলেন যে এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু ইত্যাদি সব কিছুই তাঁরই সৃষ্টি। তিনি বিশ্ব চরাচরে আবার হৃদয়মধ্যে সর্বত্রই বিরাজমান। অনিত্য জগৎ-সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হওয়ায় ভক্ত ভগবানে নিত্যযুক্ত হন।

অনিত্য সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিত্য-তত্ত্ব অভিমুখী নানাপ্রকার সাধক আছেন।এতক্ষণ ভক্ত-সাধকদের বর্ণনা করার পর, এবার অন্য সাধকদের বর্ণনা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে করেছেন।

9.15

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে, যজন্তো মামুপাসতে
একত্বেন পৃথক্ত্বেন, বহুধা বিশ্বতোমুখম্।।15।।

কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে একইভাবে (অভেদ-ভাবে) আমার পূজা দ্বারা আমাকে উপাসনা করেন, আবার অন্য কোনো সাধক নিজেকে পৃথক বলে মনে করে আমার বিরাট রূপের বা সংসারকে আমার বিরাট রূপ মনে করে (সেবা ভাবের দ্বারা) নানা প্রকারে - আমার উপাসনা করেন।

সাধক জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানযোগের সাহায্যে অসৎ পরিত্যাগ করে সর্বত্র পরিব্যপ্ত-স্বরূপ সৎ পরমতত্ত্বকে এবং নিজ প্রকৃত স্বরূপকে এক বলে মেনে নিয়ে নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের উপাসনা করেন। এটি হচ্ছে অদ্বৈতভাব। কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞানও দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকারের হতে পারে। দ্বৈতবাদী সাধকদের ভগবানের সাথে পৃথক ভাব থাকে। ভক্তের ভাব হচ্ছে — 'হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস (দ্বৈতভাবে প্রভু শ্রী রামচন্দ্র এবং তাঁর সেবক হনুমানজী); তুমি মা, আমি তোমার সন্তান (দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণী এবং ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ)'।

একবার প্রভু শ্রীরাম তাঁর প্রিয় ভক্ত হনুমানজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হনুমান, তোমার সাথে আমার কী প্রকার সম্বন্ধ?" হনুমানজী ছিলেন **'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্য'** অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী। প্রভুর প্রশ্নে হনুমানজী বললেন, " হে প্রভু, কোন ভূমিকায় আপনি এই প্রশ্নটি করছেন, দয়া করে বলুন। আপনি কি দেহভূমি থেকে জিজ্ঞাসা করছেন, জীবের দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞাসা করছেন, নাকি আপনি আত্মদৃষ্টি থেকে জিজ্ঞাসা করছেন?" হনুমানজী পুনরায় বললেন, **"দেহদৃষ্ট্যা দাসোঽম্, জীবদৃষ্ট্যা অংশোঽম্ ,আত্মদৃষ্ট্যা ত্বমেবাঽম্"** অর্থাৎ যদি দেহদৃষ্টি দিয়ে দেখেন তাহলে আপনি প্রভু, আমি আপনার দাস; যদি সেই চৈতন্য ও জীবের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তাহলে আপনি পূর্ণ, আমি আপনারই এক অংশ; এবং যদি আত্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তাহলে আপনি এবং আমি একই, ভিন্ন নই।'

কোন কোন কর্মযোগী সাধক নিজেকে সেবক বলে মনে করেন এবং জগৎ ভগবানের মনে করে সমাজ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। গরীব-দুঃখীর সেবাই ভগবানের আরাধনা— এই সেব্য -সেবক ভাবের দ্বারা সমাজ কল্যাণে ব্রতী হন। স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী অতি সুপরিচিত—

বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি, কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

সাধক নিজের রুচি,যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথক পৃথক সাধনা দ্বারা যাঁরই উপাসনা করুক না কেন, তাতে পরমেশ্বরের সমগ্ররূপেরই উপাসনা করা হয়। পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ভগবান তাঁর সমগ্ররূপের বর্ণনা করেছেন।

9.16

অহং(ঙ্) ক্রতুরহং(য়ঁ্) য়জ্ঞঃ(স্), স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যম্, অহমগ্নিরহং(ম্) হুতম্॥9.16॥

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, মন্ত্র আমি, আমিই ঘৃত, আমি অগ্নি এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়াও আমি।

'অহং ক্রতুরহং য়জ্ঞঃ স্বধা হমহমৌষধম্' — বৈদিক রীতিতে যা করা হয়, তা হল 'ক্রতু' এবং স্মার্ত রীতিতে (পৌরাণিক রীতিতে) যা করা হয় অর্থাৎ যেগুলোকে পঞ্চমহাযজ্ঞ ইত্যাদি স্মার্ত -কর্ম বলা হয় , তা হল যজ্ঞ। ভগবান বলেছেন যে তিনিই 'ক্রতু' আবার তিনিই 'যজ্ঞ'। পিতৃপুরুষের জন্য যে অন্ন-জল অর্পণ করা হয়, তাকে বলা হয় 'স্বধা'। ভগবান বলেছেন যে তিনিই 'স্বধা'। এমনকী এই 'ক্রতু','যজ্ঞ' এবং স্বধার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাৎ ফল,ফুল,যব, তিল ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রীও তিনিই।

'মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্' — ভগবান বলেছেন,"যে মন্ত্রের দ্বারা ক্রতু,যজ্ঞ এবং স্বধা আদি কর্ম সম্পন্ন হয়, সেই মন্ত্রও আমি। যজ্ঞাদির জন্য যে গব্য ঘৃতের প্রয়োজন হয়– তাও আমি। যে অগ্নির দ্বারা হোম করা হয়, সেই অগ্নি এবং হবন কার্যও আমি।"

ভগবান পুনরায় বলেছেন—

9.17

পিতাহমস্য জগতো, মাতা ধাতা পিতামহঃ
বেদ্যং(ম্) পবিত্রমোঙ্কার, ঋক্ সাম যজুরেব চ।।17।।

যা কিছু জ্ঞেয়, পবিত্র, ওঁকার, ঋক-সাম-যজুঃ বেদও আমি। এই সমগ্র জগতের পিতা, ধাতা, মাতা, পিতামহ...

'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ' — ভগবান বলছেন যে এই জড়-চেতন,স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সমস্ত জগৎ তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি এবং তিনিই এই জগৎকে রক্ষা করেন। তাই তিনি জগতের **'পিতা'** ।

এই জগৎ-সংসারকে সর্বভাবে তিনিই ধারণ করে আছেন এবং সংসারের যা কিছু বিধান, সেটি তিনিই করেন| তাই তিনি জগতের **'ধাতা'।**

জীবগণের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে যে যে যোনিতে এবং যেমন শরীরের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ দেহ তিনিই উৎপাদন করেন অর্থাৎ তিনিই এই জগতের **'মাতা'।**

লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে যে ব্রহ্মা সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা| সেই দৃষ্টিতে ব্রহ্মা সকলের পিতা। ব্রহ্মা ভগবানের নাভিপদ্ম হতেই প্রকটিত হয়েছেন; সেই অর্থে ভগবান ব্রহ্মার পিতা এবং সমস্ত প্রাণীর **'পিতামহ'।**

মূল কথা হল এই যে, ভগবান জগতের পিতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ; জগতের মাতা অর্থাৎ উপাদান কারণ (অপরা প্রকৃতি); তিনি পিতামহ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিরও কারণ।

'বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ' — বেদে বর্ণিত যে বিধি, তা ঠিকমত জানাকে বলা হয় **'বেদ্য'**| তাৎপর্য হল যে, কামনা পূরণ বা নিবৃত্তির জন্য বৈদিক ও শাস্ত্রীয় যে সমস্ত পূজা, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তা বিধি-বিধানসহ সর্বাঙ্গীণভাবে হওয়া উচিত। সুতরাং বিধি-নিয়ম জানার সমস্ত ব্যাপারটিই **'বেদ্য'** নামে অভিহিত হয়। ভগবান বলেছেন যে এই 'বেদ্য' তাঁরই স্বরূপ।

যজ্ঞ ,দান ও তপ — এই তিন ক্রিয়া নিষ্কাম ব্যক্তিদের মহাপবিত্র করে তোলে| এতে নিষ্কামভাবে যে হব্য ইত্যাদি বস্তু ব্যয় হয় তাও পবিত্র হয়ে যায় এবং এতে নিষ্কামভাব রেখে যে ক্রিয়া করা হয়, তাও পবিত্র হয়ে উঠে। ভগবান বলেছেন যে এই **পবিত্রতা** তাঁরই স্বরূপ।

ক্রতু, যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, সেই সবের আগে **'ওঁ'** উচ্চারিত হয়| এটি উচ্চারণ করলে বেদমন্ত্রের অভীষ্ট ফল লাভ হয়। বেদজ্ঞগণের যজ্ঞ, দান ও তপ ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহ 'ওঁ' উচ্চারণ করে আরম্ভ হয়| বৈদিকগণের কাছে প্রণব মন্ত্র অর্থাৎ 'ওঁ' উচ্চারণ মুখ্য| তাই ভগবান **'ওঁ'** কে তাঁর স্বরূপ বলেছেন|

ক্রতু, যজ্ঞ ইত্যাদির শাস্ত্রীয় বিধি তিনটি বেদ-এ উল্লেখ আছে — **ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ।** ভগবান বলেছেন যে এই তিনটি বেদ-ই তাঁর স্বরূপ।

নিজের বর্ণনা সম্পর্কে ভগবান আরও বলেছেন ---

9.18

গতির্ভর্তা প্রভুঃ(স্) সাক্ষী, নিবাসঃ(শ্) শরণং(ম্) সুহৃৎ
প্রভবঃ(ফ্) প্রলয়ঃ(স্) স্থানং(ন্), নিধানং(ম্) বীজমব্যয়ম্।।18।।

..গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, সুহৃদ, উৎপত্তি, প্রলয়, স্থান, নিধান এবং অবিনাশী বীজও আমি।

বিবিধ কর্ম বা সাধনায় যে গতি বা ফল পাওয়া যায়, সেটি তিনিই। যে যাই করুক, ভগবান তার শেষ **'গতি'**। ভগবানই সংসারের ভরণ-পোষণকারী, তাই তিনি **'ভর্তা'**। সমস্ত জগৎ সংসারের তিনিই মালিক, তাই তিনি **'প্রভু'**। শুভাশুভ যে কোন কাজ মানুষ করে এবং তিনি সবই দেখেন, সেজন্য তিনিই **'সাক্ষী'**। ভগবানেই সর্বভূতের বাস, তাই তিনি

'নিবাস'। যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, সেই **'শরণ'** অর্থাৎ তিনি শরণাগত বৎসল| ভগবান সমস্ত প্রাণীর হিতকরী, তাই তিনি **'সুহৃদ্'** অর্থাৎ হিতৈষী।

সমস্ত জগৎ পরমাত্মা হতে উৎপন্ন হয় এবং পরমাত্মাতেই লীন হয়ে যায়, তাই তিনি **'প্রভব' এবং 'প্রলয়'** অর্থাৎ তিনিই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত জগৎ ভগবানেই অবস্থান করে, তাই তিনি জগতের **'স্থান'**। মহাসর্গে বা মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ সব অবস্থাতেই প্রকৃতি,সংসার,জীব এবং যা কিছু দেখা, শোনা এবং বোঝা যায়, তা সবই পরমাত্মাতে অবস্থান করে, তাই তিনি **'নিধান'**।

জাগতিক বীজ গাছ থেকে উৎপন্ন হয়| সেই বীজ বপন করলে গাছ হয় এবং তারপর বীজটি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান সেরূপ নন। তিনি অনাদি, তাঁর জন্ম হয় না। তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করলেও একইভাবে অবস্থান করেন। তাই তিনি হলেন **'অব্যয় বীজ'**।

জ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে, তেমনই ভক্তির দৃষ্টিতে ভগবানের বস্তুই ভগবানকে অর্পণ করা হচ্ছে। মানুষ গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গা পূজা করে , তেমনই ভগবানের বস্তু দ্বারাই ভগবানের পূজা হয়।**প্রকৃতপক্ষে পূজ্যও ভগবান, পূজার সামগ্রীও ভগবান, পূজাও ভগবান এবং পূজকও ভগবান।**

9.19

তপাম্যহমহং(বৃঁ) বর্ষং(ন্), নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং(ঞ্) চৈব মৃত্যুশ্চ, সদসচ্চাহমর্জুন॥9.19॥

হে অর্জুন! (জগতের হিতার্থে) আমি সূর্যরূপে তাপিত করি, জলকে আকর্ষণ করি এবং পুনরায় সেই জলকে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করি। (অধিক আর কী বলব) আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ এবং অসৎও আমি ।

সূর্য জগতের হিতার্থে তাপ বিকীরণ করেন যার ফলে পৃথিবীতে রোগ সৃষ্টিকারী যা কিছু অশুদ্ধ, দূষিত জিনিস, সেগুলো নষ্ট হয়ে পরিবেশ শুদ্ধ হয়। সূর্যের কিরণে অশুদ্ধ জল বাস্প হয়ে উড়ে যায় এবং সেই বাস্প পুনরায় নির্মল জল হয়ে বর্ষারূপে বর্ষণ হয় এবং প্রাণীদের জীবিকা নির্বাহ হয়। ভগবান বলেছেন যে জগতের কল্যাণার্থে তিনিই সূর্যরূপে এইসব কর্ম করেন।

ভগবান বলেছেন যে তিনিই অমৃত এবং তিনিই মৃত্যু, অর্থাৎ জীবমাত্রেরই প্রাণ ধারণ করে জীবিত থাকা এবং সমস্ত জীবের প্রাণবিয়োগ হওয়ার কার্যকারণ স্বয়ং ভগবান। তিনি আরও বলেছেন যে সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য সবই স্বয়ং ভগবান। স্থুলচক্ষে এগুলো বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন বাঁচা ও মরা , উৎপত্তি ও বিনাশ, কার্য ও কারণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎরূপে প্রকটিত হওয়ায়, ভগবানই সবকিছু হয়ে থাকায় সবই এক ; ভগবান ভিন্ন এদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও ভগবান বিরাজমান ছিলেন এবং সৃষ্টির পরেও তিনিই থাকবেন। তাহলে মধ্যবর্তীকালে অন্য কেউ কী করে আসবেন? অতএব অমৃত যেমন ভগবদ্স্বরূপ, মৃত্যুও তেমনি ভগবদ্স্বরূপ; সৎ (পরাপ্রকৃতি) এবং অসৎ (অপরাপ্রকৃতি) উভয়ই ভগবানের স্বরূপ। অর্থাৎ সবকিছুই ভগবান, তিনি বিনা এই জগৎ-সংসারে আর কিছুই নেই।

আজকের বিবেচন সত্র এখানেই শেষ হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়।

:: প্রশ্নোত্তর পর্ব ::

প্রশ্নকর্তা—শ্রী মোহন দাদা
প্রশ্ন: মহাত্মাগণ বলেন যে মন্দিরে গিয়ে আরাধনা করার কোন প্রয়োজন নেই| এটা কী সত্যি?
উত্তর: মহাত্মাগণ কী প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন সেটি প্রথমে দেখা আবশ্যক| তাঁদের এই ধরণের উক্তির তাৎপর্য হল এই যে, সমস্ত প্রাণীর অন্তরে পরমাত্মা অংশরূপে বিরাজমান, তাই পরমাত্মার খোঁজে অন্যত্র যাবার বাধ্য-বাধকতা নেই। মন্দিরে ভগবান বিরাজ করেন না, সেটি মহাত্মাগণ বলেন নি| ভগবান বিশ্বচরাচরে সর্বত্র বিরাজমান, অন্তরেও তিনি

আবার বাইরেও তিনি। তিনি সাকাররূপেও বিরাজমান আবার নিরাকার রূপেও বিরাজমান। নিরাকারে ঈশ্বরের আরাধনা কষ্টকর যা ভগবান স্বয়ং দ্বাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। মন্দিরে ভক্তজনের প্রার্থনা, কীর্তন ইত্যাদিতে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সাধন ভজনের উপযোগী। কিন্তু মন্দিরে না গিয়েও নিরাকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব সেটাই মহাত্মাগণ বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রশ্নকর্ত্রী: শ্রীমতী সবিতা দিদি
প্রশ্ন: যখন ভগবানই পিতা , মাতা ও পিতামহ এবং তিনিই জন্মদাতা এবং মৃত্যুদাতা, তাহলে আমরা কী কেবল 'ওঁ' এর আরাধনা পারি?
উত্তর: সনাতন ধর্মে সাধন-পদ্ধতির বাধ্য-বাধকতা নেই। সাধকের নিজের রুচি অনুযায়ী সাধন প্রণালী গ্রহণ করার অধিকার আছে। ওঁঙ্কার-- সগুণ এবং নির্গুণ, উভয় প্রকার সাধন পদ্ধতিতেই উপযোগী।

প্রশ্নকর্ত্রী: শ্রীমতী সীমা দিদি
প্রশ্ন: আমরা জেনেছি যে আত্মা পরমাত্মার অংশ| পরমাত্মাই যেহেতু সৃষ্টিকর্তা, তাহলে আত্মাতে তিনি আসুরীগুণ কেন দিয়েছেন?
উত্তর: পরমাত্মা গুণাতীত। কিন্তু সৃষ্টি রচনার প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির তিনটি গুণের সমাবেশ হয়। সোনার গহনা পাকা সোনা দিয়ে বানানো সম্ভব হয় না। কিছু খাদ অর্থাৎ অন্য ধাতুর মিশ্রণ দরকার। পরমাত্মার ন্যায় আত্মাও অবিনাশী। কিন্তু পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী জীব এই তিনটি গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তম

ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে সঙ্গে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে। জীবের ইহজন্মের কর্মফলের উপর জীবাত্মার পরজন্মের গুণাদি নির্ভর করে।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
Let's come together with the motto of Geeta Pariwar, and gift our Geeta Classes to all our Family, friends & acquaintances

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||